একক ২ □ রবীন্দ্রনাটক

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

২.৩ অনুশীলনী

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে নাট্যরচনার প্রচেষ্টা প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। প্রথমযুগের নাট্যপ্রয়াস ছিল এই ধারার অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের আগে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধুমিত্র, গিরিশিচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়র নাটকে সেই পথ ধরেই বহিরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত বহুল প্রকাশধর্মিতা দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃত ঐতিহ্যের ভাবানুসরণ ও পশ্চাত্য নাটকের আদর্শের সমন্বয়ে বাংলা নাটক বিকাশের পথে এগোচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে উন্মোচিত করলেন অন্তর্জগৎ। তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত বৈশিষ্ট্যে নাটক হ'য়ে উঠলো নতুনতর এক সাহিত্যমাধ্যম, যেখানে অনুভূতির গভীরতা ও ভাবের প্রাধান্য। এজন্যেই এডওয়ার্ড টমসনের মন্তব্যটি যথাযথ বলেই আমাদের মনে হয়—

> "His dramatic work is the vehicle of
> ideas, rather than the expression of action"

রবীন্দ্রনাটকে এই ভাবময়তারই প্রাধান্য, তাঁর কবিসত্তার অনির্বাণ আলোতে তাঁর নাটকগুলিও আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠার কালে পারিবারিক নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ তাঁর হ'য়েছিল এবং অলক্ষ্যে সেই ধারা তাঁর মনে সঞ্চারিত হ'য়ে পরবর্তীকালে সার্থক প্রকাশগৌরবে অভিনন্দিত হ'য়েছিল।

রবীন্দ্রনাটক পর্ব থেকে পর্বান্তরে নবরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবু সামগ্রিকভাবে তাঁর নাটকে এক গীতময়তা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়র উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে।

—"রবীন্দ্রমানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীত ধর্মী মানস যে কাব্যেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে সর্বত্রই ইহার প্রকাশ দেখা যায়, নাটকেও তাহাই।"

২.২ পাঠ ও আলোচনা

২.২.১ প্রথম পর্ব

প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকে এই লীরিক্যাল বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা—এই পর্বের রচনা। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক—'রুদ্রচণ্ড'। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রুদ্রচণ্ড' তারই নাট্যরূপ বলে অনুমিত।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও ১৮৮৮ তে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' অনেকটাই পাশ্চাত্য-অপেরাধর্মী নাট্যপ্রয়াস। কবির নিজের ভাষায় 'বাল্মীকি প্রতিভা' গানের সূত্রে নাট্যের মালা' এবং মায়ার খেলকা 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা।' ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'কালমৃগয়া'-র অনেকখানি অংশ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই গীতিনাটিকার বিষয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় দস্যুরত্নাকরের মানস উত্তরণের দিকটি প্রকাশিত। তার হৃদয়দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম ও ভাবময়। বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অভিনয়ের কারণেও নাটকটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবী সরস্বতীর ভূমিকায় ছিলে। বাল্মীকি প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে।

সখীসমিতির অনুরোধে 'মায়ার খেলা' রচিত হয় এবং বেথুন কলেজে প্রথম অভিনীত হয়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য প্রয়াস যা গানের ছাঁচে চালা নয়। বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ মৌলিক। এখানেই আমরা প্রথম একটি বিশিষ্ট নাটকীয় রসের আস্বাদন লাভ করি। টমসন সাহেবের মতে এটিই রবীন্দ্রনাথের "first important drama".

এই নাটিকার নায়ক একজন সন্ন্যাসী। তিতিন সমস্ত আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে নির্জন গুহায় সাধনরত। একদিন এক পিতৃমাতৃহীন সর্বজনঘৃণিত অসহায় বালিকার প্রতি মমতাবশত তিনি তাকে আপনার কাছে আশ্রয় দেন। সর্ববন্ধনরিক্ত এই সন্ন্যাসীকে ক্ষুদ্র বালিকা তার ভালবাসা দিয়ে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে কিভাবে ফিরিয়ে আনলো—তাই নাটকের বিষয়। শেষপর্যন্ত কন্যাটিকে হারিয়ে সন্ন্যাসী বিশ্বচরাচরে তাকেই অনুভব করলেন, সীমা ও অসীম একাকার হ'য়ে গেল।

২.২.২ দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্রনাট্য ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০) ও মালিনী (১৮৯৬) এই পর্বের প্রখ্যাত কাব্যনাট্যত্রয়ী। ভাবকল্পনার ধারায় এই তিনটি নাটক সমধর্মী তিনটি নাটকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আঙ্গিক রচনায় মিলেছে পাশ্চাত্য ধারা। গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির প্রভাব তিনটি নাটকেই লক্ষ্য করা যায়।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র সমকালে রচিত কাব্য 'মানসী' (১৮৯০)। মানসীর নিষ্ফল কামনা কবিতাটিতে আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর প্রকাশ। প্রেমের এই সীমা-অসীম তত্ত্বই প্রধানত 'রাজা ও রাণী' নাটকে রূপ লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা,
সমগ্র মানবকে পাইতে চাহিবার দুঃসাহস
রাজা ও রাণীর ট্র্যাজেডি।"

এই নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কাঠামোয় একটি কল্পিত কাহিনী। রাজা বিক্রমদের ও রাণী সুমিত্রার যুগল প্রাধান্য নামকরণে প্রকাশিত। তাদের উভয়ের রাজা ও রাণী সত্তার সংঘর্ষ ও সংঘাতে দ্বন্দ্ব জর্জর ক্ষতবিক্ষত আত্মানুসন্ধান নাটকটির প্রতিপাদ্য।

এ নাটকে শেক্সপীরীয় প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় পাই। 'জীবনস্মৃতি'র ভগ্নহৃদয় পর্বে নিজেই বলেছেন—শেক্সপীয়র ছিলেন তখনকার আদর্শ। পরবর্তীকালেও 'মালিনী' নাটকের ভূমিকাতে লিখেছেন—

"শেক্সপীয়র -এর নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। এর বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকে আমাদের মনকে অধিকার করেছে"

'রাজা ও রাণী' নাটকের প্রদান চরিত্রে প্রবৃত্তির প্রবল আলোড়ন শেক্সপীয়রকেই মনে করায়। বিক্রমদেব একটি অসামান্য নাটকীয় চরিত্র। ঈর্ষা ও আত্মদানে কিছুটা 'ওথেলো'র ও প্যাশনের তীব্রতায় অ্যান্টনীর (অ্যান্টনী এ্যন্ড ক্লিওপেট্রা) সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাই। তার তীব্র আবেগপ্রবণ, প্রবৃত্তি পরায়ণ চিত্তদাহ শেক্সপীরীয় আবেগের আতিশয্যকে মনে করায়। প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বিক্রম চরিত্র যথার্থই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে দীর্ণ এক নাটকীয় চরিত্র। তবে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বোধের মহিমাও এ চরিত্রে প্রকাশিত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে নাটকীয় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অনেক সময়ই গীতি ধর্মী আবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় নাটকটি মাঝে মাঝে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে।

পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। বহু আলোচিত ও জনপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচক টমসন বলেছেন—

"Sacrifice is the greatest drama in Bengali literature"

এই নাটকের বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন—"বিসর্জন নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ।" তিনি দেখিয়েছেন প্রথা প্রেমকে বিনাশ করতে চাইলে প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই প্রথার অভ্যাস থেকে রঘুপতি চরিত্রে এসেছে প্রতাপের অহংকার। সেই প্রতাপ চূর্ণ হ'ল প্রেমের শক্তির কাছে—এটিই নাটকের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সব দ্বন্দ্বের অবসানে প্রেমের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী 'রাজা ও রাণী'-তে আসক্তির বিরুদ্ধে প্রেমের জয় ঘোষিত—এ নাটকে প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের সংগ্রাম চিত্রিত, যেখানে শেষপর্যন্ত প্রেমই জয়ী হ'য়েছে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের প্রেক্ষিতে দেবী মন্দিরে জীব বলিদানের বিরুদ্ধে নাট্যকারের মানবতাবাদী মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। রাজা গোবিন্দ মাণিক্য প্রেমের ধ্রুব আদর্শে অবিচল এক চরিত্র। রাজপুরোহিত রঘুপতি প্রথা ও আচার-সর্বস্ব ধর্ম আচরণের অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী। এই দু'জনের দ্বন্দ্ব সংকটের মাঝখানে জয়সিংহ যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক আবার দোলাচল আত্মসংকটের আবর্তে সে যেন শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শ প্রতিভূ।

এই দু'টি পঞ্চাঙ্ক নাটকের পর রচিত হয় 'মালিনী' ক্ষুদ্র নাটিকা—যার মধ্যে নাট্যকার ট্রেভেলিয়ন খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রীক নাটকের প্রতিরূপ—"সংযত, সংহত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন"।

এ নাটকেও সনাতন প্রথা ও ধর্মের সঙ্গে নবধর্মের বিরোধ চিত্রিত। 'বিসর্জন' নাটকের বলিদান প্রথা বন্ধের সঙ্গে কোথাও যেন বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ব্রত জড়িত। আবার মালিনীতেও দেখেছি নবধর্মে এই অহিংসার তির্যক প্রতিফলন, এই নাটিকাতে—প্রধান তিনটি চরিত্র—ক্ষেমংকর, সুপ্রিয় ও মালিনী। মাত্র চারটি দৃশ্য সম্বলিত এ নাটিকাটি সত্যই সংহত ও সংযত—যা ক্ল্যাসিক গ্রীক নাট্য পদ্ধতিকে মনে করায়।

তিনটি নাটকই ট্র্যাজেডির সার্থক নিদর্শন। চরিত্র চিত্রণে ও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা লক্ষণীয়।

২.২.৩ তৃতীয় পর্ব

পরবর্তী চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ও বিদায় অভিশাপ নাট্যরূপের আশ্রয়ে কাব্য। সমালোচক বলেন "ইহাদের ভাববস্তু একটা নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মূলত ইহারা নাট্য নহে।" এগুলি বিশেষ ধরনের শ্রুতিনাটক বা Reading drama-র সমপর্যায়ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র কাহিনী অংশের অন্তর্গত বিখ্যাত কয়েকটি কাব্য-নাট্য হ'ল—গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষীর পরীক্ষা ও কর্ণকুন্তী সংবাদ।

এগুলির কাব্যমূল্য অসাধারণ, তবে এদের নাট্যগুণ ও বৈশিষ্ট্যও উল্লেখের দাবি রাখে। 'সতী' কাব্যনাট্য-তে সমাজ, ধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কারের সঙ্গে বাৎসল্য রসের সংঘাতে নাটকীয়তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকাওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ থেকে এর কাহিনী গৃহীত।

'নরকবাস' পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। রাজা সোমকের পিতৃধর্ম ক্ষাত্রধর্মের গর্বের নিকট আহত ও অবমানিত। তবে এ পর্যায়ে নাটকীয় শ্রেষ্ঠত্ব তার চরম সীমা স্পর্শ করেছে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্য নাট্য দুটিতে। মহাভারতের চরিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এ দু'টিতে অসামান্য নাট্যমুহূর্ত' রচনা করেছেন। গান্ধারী চরিত্রে নারীর স্বামীভক্তি ও পুত্রস্নেহের সঙ্গে শাশ্বত নিত্য মানবধর্মের সংঘাতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এদু'টি চরিত্র দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জর ট্র্যাজিক মহিমাদীপ্ত। বিশেষত কর্ণ চরিত্রে মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু সত্তার সঙ্গে মানবধর্মের সংঘাতে যে দোলাচলতা সৃষ্ট তা তাকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের মহিমা দান করেছে। কুন্তী চরিত্রের অকথিত বেদনাকেও রবীন্দ্রনাথ মরমী দৃষ্টি প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে উদ্ভাসিত করেছেন।

উনিশশতকের রেনেসাঁসের দীপ্ত চেতনালোকে নবমানবতা-বাদের স্পর্শে চরিত্রগুলি নব রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে।

এদের মধ্যে 'লক্ষীর পরীক্ষা' কিছুটা স্বতন্ত্র। লঘু সুর তালে ছন্দে ঘেরা এই কাব্যনাট্যে অনাবিল হাসির স্রোত প্রবাহিত। তাই মধ্যে মানবমনের নিগূঢ় রহস্য আভাসিত।

২.২.৪ চতুর্থ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র নাট্য ধারায় কৌতুকস্নিগ্ধ সরসতার ছায়া পড়েছে। 'ব্যঙ্গ কৌতুক' ও হাস্যকৌতুক (১৯০৭), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষরক্ষা (১৯২৮) ও তাসের দেশ (১৯৩০) এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

হাস্যকৌতুকের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"এই ক্ষুদ্র কৌতুক নাট্যগুলি হেঁয়ালি নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'-তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (Charade) নামক একপ্রকার নাট্য খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়"।

এর সবকটি নাটকই অতি ক্ষুদ্রকায়। কৌতুকাবহ বিষয় ও সংলাপের মধ্য দিয়ে এগুলি অনাবিল হাসির রস সঞ্চার করে। 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গ কৌতুকের অন্তর্গত দুটি নাট্য—'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'বশীকরণে'র মধ্যে শেষোক্তটি সাহিত্যবিচারে অতি উচ্চমানের।

'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক, প্রথম প্রহসন—সুতরাং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার্য। এর

কৌতুকের মূলে আছে ভ্রান্তিবিলাস—যাকে বলতে পারি 'Comedy of errors'। এটিকে প্রহসন বলা চলে না, পুরোপুরি রোম্যান্টিক কমেডি। নামের ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে ঘটনাবর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটিত হ'য়েছে এবং নির্ভেজাল কৌতুকস্নিগ্ধ নির্মল হাস্যরসে নাটকটি দীপ্ত উজ্জ্বল। অনেক পরে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এর পরিমার্জিত অভিনয়োপযোগী রূপ দেন, সেটি 'শেষরক্ষা' নামে জনপ্রিয় ও পরিচিত।

চিরকুমার সভা প্রথমে উপন্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এর নাম হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', কিন্তু শেষপর্যন্ত কবি উপন্যাসটির পরিমার্জিত নাট্যরূপ দেন—তখন এটি 'চিরকুমার সভা' নামেই পরিচিতি লাভ করে। 'ভারতী'র সম্পাদিকা ভাগিনেয়ী সরলাদেবীর অনুরোধে সামাজিক প্রহসন হিসাবে কবি এটি রচনা করেন। সেসময় বিবেকানন্দের আদর্শে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ এই সংসার বীতস্পৃহ সন্ন্যাসের আদর্শকে মন থেকে মাতে পারেননি। সমসাময়িক কাব্য 'ক্ষণিকা'র কবিতাতেও লঘু কৌতুকের চালে বলেছেন—

"আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না
যেমনি বলুন যিনি
আমি হবো না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী"

অসামান্য রস মধুর সংলাপ, কৌতুকাবহ পরিস্থিতি ও অনবদ্য সঙ্গীত সহযোগে 'চিরকুমার সভা' বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' অন্য দু'টি প্রহসনের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। তিনটি দৃশ্য সম্ভবলিত ক্ষুদ্র এই নাটিকা হাসি অশ্রুধারায় অনবদ্য প্রহসন। এর বিশুদ্ধ 'হিউমার' একে high comedy-তে উত্তীর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ নাটকে কেদার চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৈকুণ্ঠ চরিত্রে যে সকরুণ মাধুর্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তা' সাধারণ লঘু স্তরের প্রহসনে নয়, অতি উচ্চমানের কমেডিতেই সৃষ্টি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পুরোনো গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। বহুদিন পরে এই গল্পকেই কবি রূপান্তরিত করেন 'তাসের দেশ' নাটকে। আপাত ব্যঙ্গরসাত্মক এই নাটকে আছে এক অন্তর্লীন তত্ত্ব। আমাদের সমাজের জড় প্রাচীনপন্থী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাতে নূতন প্রাণের বন্যাধারা আনার কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ তাসের দেশের অচালয়তনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র নিয়ে এল মুক্তির গান, অনিয়মের কূল ছাপানো আনন্দ হিল্লোল। নতুন প্রাণের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে কবি এই নাটক উৎসর্গ করে প্রাণময় চাঞ্চল্যের জয়গান করলেন। এই নাটকটি অনেকাংশেই রূপক নাট্যকে স্পর্শ করেছে।

২.২.৫ পঞ্চম পর্ব

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় রূপক-সাংকেতিক নাটক এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এগুলিকে সামগ্রিক ভাবে তত্ত্বনাটক বলা যুক্তিসঙ্গত। রবীন্দ্রমনোলোকের এক গভীর পরিচয় এই নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। সমালোচক টমসন যে রবীন্দ্রনাটক সমূহকে আইডিয়া বা ভাবের প্রকাশক বলেছেন, তা এজাতীয় নাটকগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্যধারায় ক্রম পর্যায়ে এসেছে—শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১১), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), রথের রশি (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

বাংলা সাংকেতিক নাটকের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে অবশ্য রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের। সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে রূপকের নিবিড় যোগ থাকলেও দুটি ভিন্ন প্রকরণ। কিন্তু দুটিতেই প্রতীকের ব্যবহার এবং তত্ত্বের প্রাধান্য থাকায় অনেক সময় রূপক সাংকেতিক একই সঙ্গে উচ্চারিত ও আলোচিত হ'য়ে থাকে। পাশ্চাত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই সাংকেতিক নাটকের জন্ম সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় নাটকে ভারতীয়

অধ্যাত্মদর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদ মিলেছে। সীমার সঙ্গে অসীমর রূপের সঙ্গে অরূপের মিলন সাধনের মধ্যেই আছে লীলারহস্য প্রকাশের সংকেত। সেই লীলাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার অক্ষমতাই সংকেতের জন্ম দিয়েছে। অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতীকী আভাসই সংকেতের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অলোকচারী মানসে অরূপতত্ত্ব যখন প্রকাশের পথ খুঁজছে, তখনই সংকেতের মাধ্যমে তা' খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রজীবনে আলোকচারণার যুগে এই শ্রেণীর নাটকের আত্মপ্রকাশ।

এই শ্রেণীর প্রথম নাটক-শারদোৎসব (১৯০৮)। শরৎ ঋতুর আনন্দাৎসবের মধ্য দিয়ে প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির অকৃপণ দানের ঋণশোধ করার কথা এ নাটকে আভাসিত।

বৌদ্ধ আখ্যান 'কুশজাতক' থেকে গৃহীত কাহিনীকে নবরূপ দান করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন নাটক 'রাজা' যা পরে (বঙ্গাব্দ ১৩২৬) 'অরূপরতন' নামে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত। গীতাঞ্জলির আলোকচারিতার যুগে রবীন্দ্রনাথের অরূপতত্ত্ববিষয়ক নাটক রাজার আত্মপ্রকাশ। রাজার মধ্যে দুটি তত্ত্ব—এক, অরূপের মধ্যেই রূপের সার নিহিত। দুই, দুর্গম পথ পেরিয়েই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া যায়।

'অচলায়তন' নাটকে প্রথাগত আচার সর্বস্বতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রমানসের প্রতিবাদ ধ্বনিত। মহাপঞ্চক যে অচলায়তন গড়ে তুলেছে সত্যবোধের আঘাতে তার প্রাচীর খসে পড়ে। আচারের মরুবালুরাশিতে ঢাকা পড়া অচলায়তনে গানের ঝর্ণাধারা ভেসে আসে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যধারার শ্রেষ্ঠতম ও জনপ্রিয়তম নাটক—ডাকঘর (১৯১২)। নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির সংকেত এ নাটকে দ্যোতিত। এখানে বালক অমলের আসন্ন মৃত্যুছায়ার প্রেক্ষিতে প্রতীক ও সংকেত আভাসের মাধ্যমে মানবাত্মার মুক্তির বাণী ঘোষিত। পার্থিব জীবন শত নিষেধের বেড়াজালে বন্দী করে রাখে মানবাত্মাকে, যার থেকে মুক্তি মেলে মৃত্যুতে। তাই ঈশ্বরের অমৃতবার্তা। এই অনুভবকে 'ডাকঘর' নাটকে রাজার চিঠির প্রতীকে বোঝানো হ'য়েছে। এ নাটকে অমলের ঘুমিয়ে পড়াকে অনেকে মৃত্যু বলতে চান। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার ইহজীবন অতিক্রম করে আলোকতীর্থে উত্তরণের সাংকেতিক কাহিনীই 'ডাকঘর' নাটক।

'বলাকা' কাব্যের যুগে 'ফাল্গুনী' রূপক নাটকের সৃষ্টি। কবি দেখাতে চান যে মানবজীবন ও প্রকৃতিতে গতিময়তাই প্রাণস্বরূপ। প্রাণশক্তি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারবার নিজেকে নবরূপে আবিষ্কার করছে।

যান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্তির ইশারা ধ্বনিত হ'য়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। যুবরাজ অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভেঙে ফেলেছে, মুক্তধারাকে করেছে মুক্ত।

'রক্তকরবী' আর একটি বহু আলোচিত নাট্য নাম। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রচিত এই নাটকে পাশ্চাত্য যান্ত্রিকতা জড়বাদ ও বিজ্ঞানশক্তির অপপ্রয়োগ মানবজীবনে কেমন করে অকল্যাণ বয়ে আনে, রবীন্দ্রনাথ তাই দেখাতে চেয়েছেন।

এর প্রধান চরিত্র 'নন্দিনী' একটি প্রতীকী চরিত্র। তার ভূষণ রক্তকরবী, যা প্রাণের প্রতীক, তার মনের মানুষ-রঞ্জন, যে মনকে রাঙায়। এভাবেই যক্ষপুরীর প্রাচীরে কোন ফাঁকে আসে প্রাণের হাওয়া, কাঁপিয়ে দেয় মকররাজার যক্ষপুরীর জালকে। রক্তকরবী মুক্ত প্রাণের মুক্তির গান।

'কালের যাত্রা'র মধ্যে সংকলিত দুটি রচনা—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। 'রথের রশি' সম্পর্কে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—"আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের ম্যানিফেস্টো"। সমাজে উপেক্ষিত মানুষের অধিকার বঞ্চিত শূদ্রের উত্থান এ নাটকে দেখানো হ'য়েছে। এ নাটিকার পূর্ব নাম ছিল 'রথযাত্রা'। পরিবর্তিত 'রথের রশি' নামকরণে এরগ অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা অধিকতর দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসাংকেতিক নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বারবার এসেছে। এ প্রসঙ্গে ইয়েটস্, সিঞ্জ, মেটারলিংক হাউপ্ট ম্যানের নাম মনে পড়ে। এসব প্রভাব ও আত্মীকরণ অতিরিক্ত এক অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র তত্ত্ব নাটকে পাই যা তাঁর নিজস্ব দর্শন ও প্রত্যয়জাত। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভাবের প্রাধান্য, অনুভূতির গভীরতা তাঁকে নিয়ে গেছে অতীন্দ্রিয়

লোকে যা আভাসে, সংকেতে প্রকাশ করেছে জীবনের সত্য। তাঁর সাংকেতিক নাটক তাই মূলত ভাবের বাহন, তাদের আবেদন বোধের কাছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের ভিত্তিতে যে রবীন্দ্রমানসের অধিষ্ঠান তার প্রকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের চেয়ে স্বভাবতই ভিন্নতর। কিশোর কবির যে দীক্ষা হিমলায়ের কোলে উপনিষদের দর্শনের আলোয় উজ্জীবিত হয়েছিল—তাঁর সমগ্র জীবন ছিল তারই সাধনা। সেই অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিত প্রথম ধরা দিল ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'খেয়া' কাব্যে। কবি যেন রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে যাত্রা করলেন 'খেয়া' কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর মানসসংকট ও বেদনার অভিঘাতে কবি অন্তর্লোকে মগ্ন হলেন। তখন থেকেই শুরু হল মনে মনে অসীম অরূপলোকে মানসাভিসার। তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি'র কাল (১৯১০-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

'খেয়া' কাব্যে "ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা" বলে যাকে আবাহন করেন, 'গীতালি' কাব্যে তাঁকে উদ্দেশ করেই গানের মালা গাঁথেন রবীন্দ্রনাথ—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো-"

আবার এই ইন্দ্রিয়াতীত অন্তরতমকে অনুভব করেছেন 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালায়—

"মানুষের একটি অন্তরতম ইন্দ্রিয় আছে। চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্য একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।"

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রাজার মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াতীত প্রাপ্তির কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

"আমার মনে হচ্ছে, যা পাবার জিনিস, তাকে হাতে পাবার জো নেই। যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা' ছুঁয়ে পাওয়া নয়"—এই অধরা মাধুরীর উপলব্ধিই সংকেতের মাধ্যমে প্রতিভাত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিক্রমার প্রকাশ সাংকেতিক নাট্যগুচ্ছে। সেই সময় থেকেই কবি খুঁজে ফিরেছেন রূপাতীত, সীমাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত এক সত্তাকে। রূপকে রূপান্তরে প্রকাশ করা রূপক নাট্যের বৈশিষ্ট্য, আর অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার প্রয়াস সংকেতের বৈশিষ্ট্য। বর্ণনায় অবর্ণনীয় এই ভাবই সাংকেতিকতার বৈশিষ্ট্য যা দৃশ্যত প্রতীকে আভাসিত হয়েও অধরা থেকেই যায়। এই সাংকেতিক রহস্যময়তার অতীন্দ্রিয় প্রকাশে তাঁর নাটকগুলি বিশিষ্ট ভাববাহী হ'য়ে উটেছে। তাঁর প্রথম তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"

—রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক সীমার সঙ্গে অসীমের সেই প্রেমমুক্তির গান।

২.২.৬ ষষ্ঠ পর্ব

পরবর্তী পর্যায়ের নাটকের মধ্যে আছে—গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬), পরিত্রাণ (১৯২৯), তপতী (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও বাঁশরি (১৯৩৩)।

এর আগে চিরকুমার সভার অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে কবি তাঁর আরো কয়েকটি গল্প ও নাটককে নতুনভাবে নাট্যরূপ দিতে আগ্রহী হ'লেন। তারই ফলস্বরূপ দেখা গেল পূর্ব প্রকাশিত 'কর্মফল' নাটকের রূপান্তরিত নাট্যরূপ 'শোধবোধ' এবং 'শেষের রাত্রি' গল্পের নবনাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশ'।

'শোধবোধ' একটি সামাজিক নাটিকা। নগরনির্ভর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রায়ণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে ও তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংকটে কাহিনী পরিণতির দিকে পৌঁছে যায়। তবে এ নাটকে মহত্তর কোনো জীবনবোধ বা দার্শনিক তত্ত্বের অবরতারণা নেই, বরং নাগরিক জীবনের বাস্তব চিত্রকে উপযুক্ত সংলাপের সাহায্যে একটি মিলনান্ত কাহিনীতে পৌঁছে দেওয়া হ'য়েছে।

তুলনায় 'গৃহপ্রবেশ' নাট্যগুণ বর্জিত। গল্প হিসাবে 'শেষের রাত্রি'তে যে করুণ মাধুরী ছিল তার লীরিক গুঞ্জন ও বিষাদ বেদনা পাঠকের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এতে নাটকীয়তার অবকাশ কম। মৃত্যুপথযাত্রী বেদনাম্লান প্রেমবঞ্চিত যতীনের দুঃখের ভার যেন পাঠকচিত্তে পাষাণ ভার হ'য়ে থাকে। কেবল মাসীর অন্তর্লীন হাহাকার ও হিমির গানের সুর গীতি মূর্ছনায় নাট্য পরিবেশকে ঘিরে থাকে। ফলে দর্শক চিত্তে কোনো নাটকীয় আলোড়ন সাড়া জাগায় না। ছোটগল্পের করুণ মাধুরীই নাটকটিকে ঘিরে থাকে।

এই দু'টি নাট্যরচনার পর পুরোণো নাটকের নব নির্মিতিতে মন দেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৯২৯ সালে নবরূপে 'পরিত্রাণ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৯ সালে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকটিও 'তপতী' নাম নিয়ে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালেই। গল্পবস্তু অভিন্ন হলেও 'তপতী' 'রাজা ও রাণী'র থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা ও রাণীর গঠন শৈথিল্য, অকারণ শাখায়িত বিস্তারকে সংহত ও সংযত করে 'তপতী' রচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছিলেন—

> "অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।....এটিকে যথাসম্ভব
> সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে এক অভিনয় যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম।"
> এই ইচ্ছা থেকেই নাটকটি আগাগোড়া পুনর্লিখিত হয়েছিল।

কালের যাত্রা (রথের রশি ও কবির দীক্ষা) নিয়ে আগেই আলোচনা হ'য়েছে তত্ত্বনাটক ধারায়। প্রায় সমকালে রচিত 'চণ্ডালিকা' (১৯৩০) নাটকেও একটি বিশেষ ভাব ও তত্ত্বকে কবি রূপ দিতে চেয়েছেন। মানবিকতার উষ্ম আলোকে রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার বিশিষ্ট বোধ এখানে সঞ্চারিত।

রবীন্দ্রনাট্য ধারায় 'বাঁশরি' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নাগরিক চেতনাঋদ্ধ এই সামাজিক নাটক তার সংলাপ ও শাণিত বাক্যে মাঝে মাঝেই 'শেষের কবিতা' কে মনে করায়। তবে নাটক হিসাবে 'বাঁশরি' কিছুটা দুর্বল। পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক রহস্য জটিলতা অনেক সময়ই প্রত্যাশিত তীব্রতা লাভ করেনা, ফলে নাটকীয়তা তেমতন দানা বাঁধে না। তবে বাঁশরিতে যে প্রেমতত্ত্ব আরোপিত তা' অকেটাই 'শেষের কবিা'র মুক্তি-বন্ধন তত্ত্বকে মনে করায়। নায়ক সোমশংকর বাঁশরিকে ভালোবেসেও বিয়ে করে সুষমাকে। কিন্তু বাঁশরির হৃদয়ে তার চির অধিষ্ঠান। প্রাত্যহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমকে অসীমে মুক্তিদানের তত্ত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

২.২.৭ সপ্তম পর্ব

প্রচলিত রীতি আশ্রয়ী নাটক হিসাবে 'বাঁশরি'ই শেষতম বলা যেতে পারে। এর পর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা সবই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। এই নতুন বর্গ (Genre) বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। এই পর্যায়ে বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ থেকে ১৩৪৩ (ইং ১৯২৬-৩৬) পর্যন্ত বিস্তৃত দশবছরে লেখা হয়—

শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর, নটীর পূজা (১৯২৬), নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭), নবীন (১৯৩০), শাপমোচন (১৯৩১), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৫) ও পরিশোধ (১৯৩৬)।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বলেছিলেন—"বাক্যের সৃষ্টির ওপর আমার সংশয় জন্মে গেছে"—তাই বাক্য রচনার প্রয়াস থামিয়ে মেতে উঠেছিলেন ছবি আঁকার বিমূর্ত শিল্পকলায়। নাটকেও তাই কেবল সংলাপ ব্যবহার না করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন গানের বন্যাধারায়। তিনি বলেছিলেন—"গান জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটা প্রধান উপাদান"। সত্যিই তাঁর এই অভিনব নাট্যপ্রয়াস গানের ঝরণাধারায় সঞ্চিত। আবার এদের মধ্যে অধিকাংশই ঋতুনাটক হওয়াতে গান সেখানে আলাদা ভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। শেষবর্ষণ, নাটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নবীন প্রভৃতি নাট্যে গান এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর 'নটরাজ' ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। নটরাজের নৃত্যরূপকে তিনি দেখেছেন মহাকালের বিরাট নৃত্যছন্দ হিসেবে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা যেন বিশ্ববীণার ছন্দে অবিরাম স্পন্দিত হ'য়ে চলেছে। তাঁর নিজের উক্তির মধ্যে দিয়েই এই প্রকৃতি তন্ময়তা সার্থক প্রকাশিত।

—"হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়" 'শাপমোচন' গদ্য ছন্দে রচিত কথিকা—বৌদ্ধ আখ্যায়িকা কুশজাতক থেকে সংগৃহীত। এই আখ্যানই 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকের উৎস। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের নৃত্যগীতময় নূতন রূপান্তর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য নাট্য। 'পরিশোধ' কথা ও কাহিনীর একটি কবিতার নাট্যরূপ, যা পরে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যরূপে প্রকাশিত।

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা—নটীর পূজা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির শ্রদ্ধার মধুর প্রকাশ এই নাট্য। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব দিনটিকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবর্ত সেখানে শ্রীমতীর তনুত্যাগ এর প্রধান বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নাট্যধারায় নবনব প্রয়োগ পরীক্ষা করে গেছেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক্য, রোম্যান্টিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রূপকাশ্রয়ী, সাংকেতিক—বিভিন্ন বিষয় য়ে তাঁর নাট্য-কাহিনী রচিত। আবার কাব্য নাট্য ও গদ্য নাট্য দু'য়েরই শিল্পিত প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছি। দেখেছি প্রহসন বা কমেডি রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা, দেখেছি ট্র্যাজিক রস সংবেদনায় তাঁর নিবিড় চরিতার্থতা। এমন সামগ্রিক প্রয়াস সত্যই সুদুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুকোণিক হীরকখণ্ড সদৃশ প্রতিভার পক্ষেই এমন বিচিত্র ও সর্বত্র প্রসারী শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল।

২.৩ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২। "শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আলোকে রবীন্দ্রনাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাবের পরিচয় দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে অন্তত একটি প্রহসনের পূর্ণ পরিচয় দিন।

৪। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাঁর এ জাতীয় নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধপ্রভাব ও প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬। 'ডাকঘর গদ্যে লীরিক' এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৭। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৮। 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৯। সাংকেতিক নাটকে গানের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।

১০। রবীন্দ্রনাথকে 'রাজা' ও 'ঠাকুরদা' চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

২. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—অশোক সেন

৩. কালের মাত্রা ঃ রবীন্দ্রনাটক—শঙ্খ ঘোষ

৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ

৫. মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ—পুলিন দাস

৬. কবির অভিনয়—অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৯৬ (রবীন্দ্রভারতী)

৭. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ১৯৯৮-সুকুমার সেন

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.